# ধানক্ষেতে গলদা চিংড়ির চাষ নির্দেশিকা

স্বাদু পানির চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)

মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।

# ধানক্ষেতে গলদা চিংড়ির চাষ নির্দেশিকা

প্রকাশকাল ঃ জুন ২০১৫ খ্রিঃ

স্বাদু পানির চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।

**সম্পাদনায় ঃ**
ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম
মোঃ ফখরুল আলম
মোহাম্মদ ইয়াছিন

**সংকলনে ঃ**

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান
প্রশান্ত কুমার সরকার
রিপন কান্তি ঘোষ

**সহযোগিতায় ঃ**

প্রফুল্ল কুমার সরকার
মোঃ আব্দুল অদুদ
মোঃ শামীম হায়দার
নারায়ন চন্দ্র মন্ডল
মোঃ মজিবুর রহমান
অমিতোষ সেন
মোঃ মোশাররফ হোসেন
মোঃ আব্দুল বারী,
অমল কান্তি রায়
নৃপেন্দ নাথ বিশ্বাস
শফিকুল ইসলাম
জয়দেব পাল

মোঃ কবির হোসেন
মোঃ নাজমুল হুদা
সরোজ কুমার মিস্ত্রি
মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা
আ ন ম মাহফুজ আল হামিদ
হাফিজুর রহমান
মোঃ কামরুজ্জামান
মোঃ মনিরুল হিসলাম
বিশ্বজিৎ বৈরাগী
এস.এম. এনামুল হক
মোঃ ইসহাক আলী

# প্রকল্প পরিচালকের কথা

"ধান ক্ষেতে গলদা চিংড়ি চাষ" বিষয়ক প্রশিক্ষণ নির্দেশিকাটি মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন স্বাদু পানির চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) হতে প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

"ধান ক্ষেতে গলদা চিংড়ি চাষ" নির্দেশিকা স্বাদু পানির চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায় ) এর প্রশিক্ষণার্থীদের কারিগরি জ্ঞানের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি সারাদেশে গলদা চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

বর্তমানে বাংলাদেশে গলদা চিংড়ি বিভিন্ন ভাবে চাষ হচ্ছে, এর মাঝে ধান ক্ষেতে ধানের পরে বা ধানের সাথে চিংড়ি চাষ হচ্ছে। ধানের সাথে গলদা চাষে হেক্টর প্রতি উৎপাদন বিদেশের তুলনায় অনেক কম। বাংলাদেশে ধান ক্ষেতে গলদা চিংড়ি চাষকৃত অঞ্চল বাগেরহাট, নড়াইল, গোপালগঞ্জ, খুলনায় সীমাবদ্ধ থাকলেও এর বাহিরে সারাদেশে ধান ক্ষেতে গলদা চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। এই সম্ভাবনা কাজে লাগাতে স্বাদু পানির চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) হতে ধান ক্ষেতে গলদা চিংড়ি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মৎস্য অধিদপ্তরের অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে নির্দেশিকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে। নির্দেশিকাটি বিভাগীয় কমর্তকর্তা, কর্মচারী ও চাষীদের সহায়ক হিসেবে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। নির্দেশিকাটি প্রকাশে মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. সৈয়দ আরিফ আজাদ মহোদয়ের মূল্যবান পরামর্শ, উৎসাহ ও সার্বিক সহায়তা প্রদান করার জন্য আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ।

মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়কে নির্দেশিকাটি প্রকাশের অনুমতি প্রদানসহ সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পাশাপাশি নির্দেশিকাটি প্রণয়নকারী কর্মকর্তা এবং সম্পাদকমন্ডলীর সদস্যদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সেই সাথে যারা শ্রম, মেধা ও সময় দিয়ে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই।

(ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম)
প্রকল্প পরিচালক
স্বাদু পানির চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।

# সূচীপত্র


| ক্রমিক নং | বিষয় | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|
| ১. | ভূমিকা | ৫ |
| ২. | ধানক্ষেতে গলদা চিংড়ি চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব, সমস্যা ও সম্ভাবনা | ৬ |
| ৩. | ধানক্ষেতে গলদা চিংড়ি চাষের ধাপসমূহ | ৭ |
| ৪. | জমি নির্বাচন | ৮ |
| ৫. | ধানের জাত নির্বাচন | ৯ |
| ৬. | ধানক্ষেতে চিংড়ি মজুদ | ১৩ |
| ৭. | মজুদ ঘনত্ব | ১৫ |
| ৮. | ধানের যত্ন | ১৬ |
| ৯. | খাদ্য ব্যবস্থাপনা | ১৮ |
| ১০. | সম্পূরক খাদ্য তৈরী | ২০ |
| ১১. | চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা | ২১ |
| ১২. | চিংড়ি আহরণ, আহরণত্তোর পরিচর্য্যা ও বাজারজাতকরণ | ২৩ |
| ১৩. | ধানক্ষেতে চিংড়ি চাষে অনুসরনীয় নীতি | ২৪ |
| ১৪. | এক নজরে উত্তম চাষ পদ্ধতি অনুসরণ | ২৮ |
| ১৫. | বাৎসরিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রেকর্ড সংরক্ষণ | ২৮ |

# ধানক্ষেতে গলদা চিংড়ি চাষ

**ভূমিকা ঃ**

আবহমান কাল থেকেই এদেশে বর্ষায় প্লাবিত ধান ক্ষেতে মাছ ও চিংড়ি এমনিতেই পাওয়া যেত। আশ্বিনের পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে ডিমুয়া ও গলদা চিংড়ি ধরার গল্প আমরা শুনে থাকি। সেদিন হয়ত এর চাষের কথা কেউ ভাবেনি। কালের ধারা কালে কালে বদলায়। পরিবর্তিত এই অবস্থায় বিশেষ করে উপকুলীয় অঞ্চলের ব্যাপক ধানক্ষেতকে গলদা চাষের জন্য ব্যবহার করা হয়। খুলনা অঞ্চলে দেশের ৯৩% গলদা উৎপাদিত হয়। এ সব গলদার অধিকাংশই ধানক্ষেতেই উৎপাদিত হয়। বর্তমানে এটিই বাংলাদেশে গলদা চিংড়ি চাষের মডেল। আজকাল বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই উফসী জাতের ধান চাষের পর একই জমিতে গলদা চিংড়ি চাষ হয়ে থাকে। এ সমস্ত জমিতে পরিকল্পিত ভাবে বাধ দিয়ে ধান ও মাছ অথবা ধান ও গলদা চিংড়ির চাষ করে বেশী লাভবান হওয়ার সুযোগ রয়েছে। বিশেষ করে গলদা অঞ্চল হিসাবে খ্যাত খুলনা, যশোর, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, নড়াইল ও বর্তমান সময়ে গোপালগঞ্জ অঞ্চলে পাড় বেধে গলদা ঘের বা খামার তৈরী করা হয। জলাবদ্ধতার কারনে যে সব জমিতে বৎসরে একটি ধানের ফসল ও ভালোভাবে করা যেত না। সে সব জমিতে এখন ধানের সাথে গলদা চিংড়ির চাষ এবং ব্যাপকভাবে শাকশব্জির চাষ করা হচ্ছে। এতে জমি থেকে আয় বেড়ে গেছে কয়েকগুণ। এসব অঞ্চলে সাধারণতঃ বোরো মৌসুমে গলদা ঘেরের জমিতে ধানের চাষ করা হয়ে থাকে। এ সময় ক্যানালে যে পানি থাকে তাতে চিংড়ির চাষও চলে। ধান কাটা হয়ে গেলে এবং বর্ষায় জমি প্লাবিত হলে তা প্রস্তুত করে নতুন করে কিশোর গলদা মজুদ করা হয়। এ ধরনের চাষকে আমরা গলদা ঘেরে ধানের চাষ হিসাবে আখ্যায়িত করতে পারি। আবার কোন কোন গলদা ঘেরে আমন মৌসুমে সরাসরি ধানের সাথে গলদা চিংড়ি ও অন্যান্য সাদা মাছের চাষ করা হয়। ইদানীং বৃহত্তর নোয়াখালী, পটুয়াখালী, বরগুনা, গোপালগঞ্জ জেলার অংশ বিশেষে কোটালীপাড়া, টুঙ্গীপাড়া) একক গলদা চাষ বেশ জনপ্রিয়। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গলদা চিংড়ির চাষ শুরু হয়েছে। বাংলাদেশে এখনও অনেক ঢালু ও নীচু জমি রয়েছে যেখানে বছরে কমপক্ষে ৪ হতে ৬ মাস কিংবা সারা বছর পুরো জমি অথবা এর অংশ বিশেষে পানি থাকে। বাংলাদেশে এ ধরনের জমির পরিমান ৪০ -৫০ লক্ষ হেঃ। তম্মধ্যে ২.০০ লক্ষ হেঃ ধান ক্ষেত মাছ ও গলদা চিংড়ি চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। এই পরিমাণ জমিতে ধানের সাথে যুগপৎভাবে গলদা চিংড়ির চাষ অথবা ধানের আগে অথবা পরে পতিত জমিতে পানি জমে থাকলে ঐ সময়ে মাছ ও গলদা চিংড়ির চাষ করা যায়। এভাবে সারা দেশে ব্যাপক এলাকায় গলদা চাষ সম্প্রসারণ করা গেলে অনায়াসেই দেশে গলদা চিংড়ির উৎপাদন ৫-৬ গুণ বাড়ানো সম্ভব হবে।

এছাড়া ও সারা দেশে যে সব জমিতে সেচের মাধ্যমে ধান চাষ করা হয় ( ৯০-১২০ দিন) সে সকল জমিতেও পরিকল্পিতভাবে ধানের সাথে চিংড়ি চাষ করা যায়। এতে সামগ্রিকভাবে চিংড়ি মৎস্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। তবে, প্রচলিত গলদা চিংড়ির চাষ হতে এধরনের চাষের কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। এক্ষেত্রে চাষির জমিতে ধানের ফসলটিই মুখ্য। সুযোগ ও সুবিধামত ধানের সাথে, ধানের আগে ও ধানের পরে কার্পজাতীয় মাছের সাথে অথবা গলদা চিংড়ি মজুদ করে বাড়তি আয় করা যায়। এতে জল ও জমির সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব।

## ধানক্ষেতে গলদা চিংড়ি চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্ব, সমস্যা ও সম্ভাবনা ঃ

**ধান ক্ষেতে গলদা চাষের সুবিধা ঃ-**

১. একই জমিতে এক বৎসরে একাধিক ফসল ফলানো যায়।
২. ধানের উৎপাদন খরচ কম হয়।
৩. জমির সর্বোত্তম ব্যবহার হয়।
৪. ধানের রোগ বালাই দমন ও কীটনাশক প্রয়োগের কুফল হতে পরিবেশ রক্ষা করা যায়।
৫. ধানের আগাছা দমন হয়।
৬. অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়া যায়।
৭. জলাবদ্ধতা দূর হয়।

**ধানক্ষেতে গলদা চিংড়ি চাষের সম্ভাবনা**

১. ক্রম হ্রাসমান জলাশয়ের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে ধানক্ষেতে গলদা চিংড়ির চাষ সম্প্রাসরণের অমিত সম্ভাবনা রয়েছে ।
২. বাংলাদেশে চার থেকে ছয় মাস পানি থাকে এরূপ জমির পরিমান ৪০-৫০ লক্ষ হেক্টর।
৩. ধান ও গলদা চিংড়ি চাষ করা যায় এমন জমির পরিমাণ ৪০ লক্ষ হেঃ বর্তমানে শুধুমাত্র ৪০ হাজার হেঃ জমিতে ধান ও গলদা চিংড়ির চাষ হয়। গলদা চিংড়ির চাষ বর্তমান অবস্থা হতে ১.০০ লক্ষ হেক্টরে সম্প্রসারণ করা সম্ভব হলে উৎপাদন ২-৩ গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। বর্তমানে গলদা চিংড়ির হেক্টর প্রতি উৎপাদন ২০০-৩০০ কেজি। চাষ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করে হেক্টর প্রতি উৎপাদন ৬০০-৭০০ কেজি পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব।
৪. বিল অঞ্চলে বিশেষ করে বোরো মৌসুমের পরে জমি পতিত থাকে। এ সব অঞ্চলে সুবিধামত ঘের তৈরী করে গলদার চাষ করা যেতে পারে।
৫. চিংড়ি রপ্তানীতে গলদার অবস্থান বর্তমানে ২৩% . । চাষের এলাকা বৃদ্ধি এবং ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের মাধ্যমে রপ্তানীর হার বহুগুনে বৃদ্ধি করা সম্ভব। সেই সাথে বিপুল সংখ্যক কর্মসংস্থান ও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব।

## ধান ক্ষেতে চিংড়ি চাষের পদ্ধতি/ প্রকারভেদ

**ধান ক্ষেতে গলদা চিংড়ি চাষ ০২ (দুই) ধরনের হতে পারে যথা ঃ-**

১) ধানের সাথে গলদা চাষ ঃ সাধারনত : অঞ্চলভেদে বর্ষা এবং বোরো মৌসুমে ধানের সাথে গলদা চিংড়ির চাষ করা যেতে পারে। আমন মৌসুমে সরাসরি ধানের সাথে গলদা চিংড়ি ও অন্যান্য সাদা মাছের চাষ করা হয়। অঞ্চল, জমি, জলাশয় ও জলবায়ুর অবস্থাভেদে কমবেশী এধরনের চাষ সারা দেশেই হতে পারে। বছরে এ ধরণের চাষ ২-৩ বার করা যেতে পারে। আবার হাওড় অথবা নীচু জমিতে বোরো মৌসুমে ধানের সাথে গলদা চাষের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

২) ধানের পরে প্লাবিত ক্ষেতে গলদা চাষ ঃ মুলত: এক ফসলী ধানী জমি এজন্য উপযোগী । বোরো মৌসুমে ধান কাটার পর বর্ষা মৌসুমে ঐ ক্ষেতে গলদা চিংড়ির চাষ করা যায়।

# ধান ক্ষেতে গলদা চিংড়ি চাষের ধাপসমূহ

## ধানের সাথে গলদা চিংড়ি চাষ-

১. জমি নির্বাচন ।
২. আইল তৈরী বা বাঁধ দেয়া ।
৩. ধানক্ষেতে গর্ত ও খাল নির্মান ।
৪. ধানের জাত নির্বাচন ।
৫. জমি চাষ দেয়া ও চুন, সার ইত্যাদি প্রয়োগ ।
৬. ধানের চারা রোপন ।
৭. গলদা চিংড়ির পোনা ছাড়া ।
৮. ধান ও চিংড়ির পরিচর্যা বা যত্ন নেয়া ।
৯. চিংড়ির খাবার দেয়া ।
১০. ধান কাটা ।
১১. গলদা চিংড়ি আহরণ ও বাজারজাতকরণ ।

## ধান কাটার পরে চিংড়ি চাষ-

১. জমি নির্বাচন ।
২. আইল তৈরী বা বাঁধ দেয়া ।
৩. ধানক্ষেতে ডোবা ও খাল নির্মান ।
৪. ধানের জাত নির্বাচন ।
৫. জমি চাষ দেয়া ।
৬. ধানের চারা রোপন ।
৭. ধানের যত্ন নেয়া ।
৮. ধান কাটা ।
৯. চিংড়ি চাষের জন্য জমি প্রস্তুত করা ।
১০. গলদা চিংড়ির পোনা ছাড়া ।
১১. চিংড়ির খাবার দেয়া ।
১২. চিংড়ির পরিচর্যা বা যত্ন নেয়া ।
১৩. গলদা চিংড়ি আহরণ ও বাজারজাতকরণ ।

## জমি নির্বাচন

বাংলাদেশে ধান ক্ষেতের নানা বৈচিত্র্য রয়েছে। অঞ্চল, অবস্থান ও জমির তল ও মাটির অবস্থা ভেদে ধানক্ষেতে পানির গভীরতা, পানি ধারণ ক্ষমতা ও সময়কাল ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। তাই জমি নির্বাচনের সময় নিম্নবর্নিত বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে হবে।

- যে সব জমিতে সারা বছর কিংবা কমপক্ষে ৪ থেকে ৬ মাস পানি ধরে রাখা সম্ভব সে সমস্ত জমি ধানের সাথে অথবা ধানের পরে গলদা চিংড়ি চাষের জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে।
- যে সমস্ত জমির অংশ বিশেষ একটু বেশী নীচু অথবা জমির ভিতরে নালা কিংবা গর্ত রয়েছে সেই সমস্ত জমি গলদা চাষের জন্য বেশী উপযোগী।
- এঁটেল বা দোঁআশ মাটির ধানক্ষেত সবচেয়ে ভাল
- জমি বন্যামুক্ত হতে হবে
- ধানক্ষেতের সন্নিকটে পানির উৎস ও সরবরাহ, নির্গমন ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।

### জমির আইল বাঁধা / মেরামত

ধানক্ষেতে চিংড়ি চাষ করতে হলে জমিতে আইল বাঁধার গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা ৫-৬ মাস পানি ধরে রাখতে না পারলে ভালো ফলন আশা করা যায় না। আইল শক্ত, মজবুত ও উচু করা হলে বাইরের দুষিত পানি প্রবেশ প্রতিরোধ, বন্যায় ভেসে যাওয়া, পানি চুইয়ে চলে যাওয়া জনিত সমস্যা থেকে চিংড়িকে রক্ষা করা যায়।

এই সময় জমিতে আগে থেকে আইল বাঁধা থাকলে তা মেরামত করে নিতে হবে। নতুন জমি হলে উঁচু, শক্ত ও মজবুত করে আইল বা বাঁধ বেধে নিতে হবে। জমির তলা সমতল করে নিতে হবে। সাধারণ বন্যায় যে পরিমান পানি হয় তার চেয়ে ১-২ ফুট উচু করে আইল তৈরী করা ভাল। আইল বা বাঁধ ভালভাবে প্রশস্ত বা মজবুত করে তৈরী করা উত্তম। এতে অবশ্য একটু জায়গা বেশী লাগে। ধান আবাদযোগ্য জায়গা কিছুটা কমে যায়। এ কারণে অনেক চাষী ভাইয়েরা সেটি করতে চান না। কিন্তু সার্বিকভাবে এতে লোকসানের কোন বালাই নাই। কেননা একটি পরিকল্পিত ধানের সাথে গলদা চাষ ক্ষেতের পাড় ঢাল ও তলা সকল অংশই আবাদযোগ্য।

গলদা চাষের জন্য পানির গভীরতা কমপক্ষে ১ মিটার হলে ভাল হয়। তবে আধুনিক অনেক জাতের ধানের জন্য এই গভীরতা উপযোগী নয়। সেক্ষেত্রে পানির গভীরতা ৩০ সে.মি. হতে ৬০ সে.মি. হলে চলে। তবে ধান ক্ষেতের পাশে বা অভ্যন্তরভাবে নালা খনন করে পানির ধারণ ক্ষমতা বা গড় গভীরতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। নালা পাড় থেকে কমপক্ষে ১০ ফুট দুরে এবং প্রশস্থ হতে হবে যেন নালার মধ্যে জাল টেনে চিংড়ি ধরা যায়। ধান ক্ষেতে ২০% এলাকায় নালা থাকলে ভাল উৎপাদন পাওয়া যায়।

## ডোবা ও খাল/নালা খনন

ধানক্ষেতে গলদা চাষের জন্য আইল বা বাধের চারপাশে ভিতরের দিকে খাল অথবা সুবিধাজনক স্থানে এক বা একাধিক ছোট ডোবা নির্মান করতে হবে যাতে প্রয়োজনে অথবা কোন সংকট মুহূর্তে চিংড়ি আশ্রয় নিতে পারে। চিংড়ি দিনের বেলায় এই নালা বা গর্তের অপেক্ষাকৃত গভীর পানিতে লুকিয়ে থাকতে পছন্দ করে। এসব গর্তে বা খালে খেজুর অথবা নারকেল পাতা, বাঁশের আটি বাধা কঞ্চি, সীমিত কলমী, বিন্নী ও শিকড় বিহীন কচুরী পানা ইত্যাদি দ্বারা আশ্রয় ও ছায়া সৃষ্টি করতে হবে। জমিতে আগে থেকেই নালা বা গর্ত করা না থাকলে তা করে নিতে হবে।

- জমির ঢালু দিকে গর্ত বা ডোবা খনন করা উত্তম।
- মোট জমির শতকরা ১০ ভাগ ডোবা ও নালা হলেই চলে। তবে নালা ও খালের পরিমান ২০-২৫ ভাগ হলে ভালো হয়।
- ডোবা বা নালার গভীরতা ১- ১.৫ মি. হলে ভালো হয়।
- ডোবার সাথে নালার সংযোগ থাকতে হবে।
- নালা প্রশস্ত এবং হেলানো ভাবে/ঢালু করে কাটতে হবে। এতে গলদার উৎপাদন বেশী হবে।

# ধানের জাত নির্বাচনঃ

ধানের জাত বাছাইয়ের সময় নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনা করা প্রয়োজন

- উচ্চ ফলনশীল জাত
- পোকার আক্রমন ও রোগ বালাই কম হয় এমন জাত
- অধিক পানি সহ্য করতে পারে
- যে জমিতে যে ধান ভাল হয়
- ধানের চাহিদা ও দাম বেশী

আধুনিক উচ্চ ফলনশীল অধিক রেগি প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন জাতের ধান-

| | |
|---|---|
| বি আর-১১ (মুক্তা)<br>বি আর-১৪ (গাজী)<br>বি আর-৩ (বিপ্লব)<br>বি আর-১৬ (শাহী বালাম)<br>বি আর-২০ (নিজামী) | বি আর-২৩<br>বি আর-২৪ (রহমত)<br>বি আর-২৭<br>বি আর-৩২<br>বি আর-৩৩ ইত্যাদি। এসব জাত ধান-মাছ চাষের জন্য উপযুক্ত। |

সতর্কতা ঃ-

স্থানীয় জাতের ধান নির্বাচন না করাই ভাল। এ জাতীয় ধানের গাছ লম্বা হয়ে পানির উপর নুয়ে পড়তে পারে। এতে পানিতে সূর্যালোক প্রবেশে বাধাগ্রস্ত হবে ফলে পানিতে মাছের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক খাদ্য জন্মানো সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে ধানের পাতা পচে পানি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

## জমি তৈরীঃ

জমিতে প্রযোজনমতো পানি দিয়ে মাটির প্রকারভেদে ২-৩ টি চাষ ও মই দিতে হবে যেন মাটি থকথকে কাদাময় হয়। জমি উঁচু নিচু থাকলে মই ও কোদল দিয়ে সমান করে নিতে হবে। সঠিক পদ্ধতিতে, সময়মতো এবং উত্তমরূপে জমি তৈরি করলে প্রাথমিকভাবে যেসব আগাছা জন্মায় তাদের দমন করা সহজ হয়। ভালভাবে জমি তৈরী করলে যেসব উপকার পাওয়া যায় সে গুলো হলো- উত্তমরূপে কাদা করা জমিতে বৃষ্টি বা সেচের পানির অপচয় কম হয় প্রথম চাষের পর অন্ততঃ ৭ দিন পর্যন্ত জমিতে পানি আটকে রাখা প্রয়োজন। এর ফলে জমির আগাছা, খড় ইত্যাদি পঁচে যাবে। আগাছা খড় পচনের ফলে গাছের খাদ্য হিসেবে নাইট্রোজেন জাতীয় সার তৈরীর সুযোগ সৃষ্টি হয়। উত্তমরূপে কাদা করা জমিতে অতি সহজে ধানের চারা রোপন করা সহজ হয় এবং সেচকৃত পানি সমানভাবে জমতে পারে। শেষ মই দেওয়ার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন জমি সমতল হয়।

## সার প্রয়োগঃ

মাটির উর্বরতা ও ধানের জাতের তারতম্য অনুযায়ী সারের পরিমান নির্ধারণ করতে হয়। ধানের সাথে চিংড়ি চাষে প্রযুক্তির দিক থেকে উন্নত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। তাই ধানের জাতটিও যথা সম্ভব উন্নত ও উচ্চ ফলনশীল হওয়া উচিত। উচ্চ ফলনশীল ধানের জন্য অনুমোদিত হার অনুযায়ী প্রতি একরে সার প্রয়োগের মাত্রা নিম্নরূপ ঃ

| সারের নাম | অনুমোদিত মাত্রা (কেজি) | মাছের জন্য বর্ধিত পরিমান (কেজি) | মোট পরিমান (কেজি) | প্রয়োগকাল |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ইউরিয়া | ৭০ | ১১ | ৮১ | তিন কিস্তিতে |
| টিএসপি | ৫৪ | ০৮ | ৬২ | শেষ চাষে |
| এমপি | ২৭ | ০৪ | ৩১ | শেষ চাষে |
| জিপসাম | ৪৫ | ০৭ | ৫২ | শেষ চাষে |

যদি জমি বেশ উর্বর হয় তাহলে ধানের জন্য অনুমোদিত মাত্রার সার দ্বারা মাছের জন্য উপযুক্ত পরিমান প্রাকৃতিক খাদ্য প্লাংক্টন ও উৎপাদিত হতে পারে। যেসব জমি কম উর্বর সেগুলোতে মাছের জন্য আলাদাভাবে অনুমোদিত মাত্রার চেয়ে ১৫% হারে বাড়তি সার প্রয়োগ করতে হবে।

## প্রয়োগকাল ঃ

অনুমোদিত মাত্রার ইউরিয়া সার তিন কিস্তিতে যথা- ধান রোপনের ৩০তম তিন, ৪৫তম দিন এবং ৬০তম দিনে উপরি প্রয়োগ করা যাবে এবং অন্যান্য সারগুলো জমিতে শেষ চাষ দিয়ে মাটি কাদা করার সময়ই মাটির সাথে মিশাতে হবে ।

## ধান রোপন পদ্ধতি ঃ

ধান লাইনে রোপন করা উত্তম । এক্ষেত্রে লাইন থেকে লাইনের দুরত্ব ২০ সে.মি., চারা থেকে চারার দুরত্ব পরিমিত । পর পর ৫-৬ সারি লাগানোর পর ৩৫-৪৫ সে.মি. ফাঁকা রাখতে হবে । পুনরায় ৫-৬ সারি লাগাতে হবে । এভাবে লাগালে চিংড়ির চলাচলে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি হবে না । পাশাপাশি প্রাকৃতিক খাবারের যোগানও নিশ্চিত হবে । চিংড়ি বাড়বে ভালো । ধানের উৎপাদনও বাড়বে বই কমবে না ।

আবার নিম্নরূপ পদ্ধতিতেও লাগানো যেতে পারে-

- প্রচলিত পদ্ধতিতে ধান চাষে সারি থেকে সারির দূরত্ব এবং গোছা থেকে গোছার দূরত্ব ৮ ইঞ্চি হয় ।
- তুলনামূলকভাবে বড় আকারের চারা রোপন করা ভাল ।
- জমির উর্বরতা শক্তিভেদে এই দূরত্ব কম বা বেশি হতে পারে ।
- মাছের জন্য আলো ও বাতাস চলাচলের সুবিধার লক্ষ্যে জোড়া সারি পদ্ধতিতে ধান লাগানো যেতে পারে । এই পদ্ধতিতে পাশাপাশি দুটি সারির দূরত্ব ৮ ইঞ্চি থেকে কমিয়ে ৬ ইঞ্চি করা হয় । এতে এক জোড়া সারি হতে অন্য এক জোড়া সারির দূরত্ব ১২ ইঞ্চি বাড়ানো যায় ।

ধান ক্ষেতে যে নালা তৈরী করা হবে সে নালার দুই ধারের সারিতে দুটি চারার মাঝখানে একটি করে অতিরিক্ত চারা লাগাতে হবে । এতে নালার জন্য যে জায়গা নষ্ট হয় তা পুষিয়ে নেয়া যায় এবং জমিতে মোট ধানের চারার সংখ্যা সমান থাকে ।

# ধান ক্ষেতে চিংড়ি মজুদ

ধানের চারা ভালভাবে মাটিতে লেগে যাওয়ার পর চারা যখন সবুজ হয়ে উঠে ( ১০-১৫ দিন পর) এবং বাড়তে শুরু করে। তখন চিংড়ি ও সাদা মাছ মজুদ করতে হবে। মজুদের জন্য কিশোর চিংড়ি উত্তম। মজুদকালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

## ১. পোনার গুণগত মান যাচাই

চিংড়ি চাষে পোনার মান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

- খোলসের স্বাভাবিক রং, উজ্জ্বলতা / স্বচ্ছতা, সুস্থ ও ভালো পরিবেশে লালিত পোনার লক্ষণ।
- উপাঙ্গ সমূহের দৃঢ়তা ও স্বভাবিকতা রোগমুক্ত চিংড়ির লক্ষণ।
- চোখের দৃঢ়তা ও উজ্জ্বলতা ভালো পোনার পরিচায়ক।
- খোলসের উপর পরজীবের (ফাংগাস,ছত্রাক ইত্যাদি) উপস্থিতি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে লালিত অসুস্থ পোনার লক্ষণ।
- খাদ্য নালীর পূর্ণতা কম থাকলে পোনা অপুষ্টি ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পালিত বুঝা যায়।
- সুস্থ ও সবল পোনার সাঁতার কাটার সময় পোনা লম্বভাবে সাতার কাটে ও পুচ্ছ ছড়ানো থাকে।
- পোনাকে বিরক্ত করলে লাফ দেয় বা পাত্রের গায়ের কাছ থেকে আচমকা সরে যায়।
- একটি পাত্রে কিছু পোনা নিয়ে যদি পানি ঘুরিয়ে স্রোত সৃষ্টি করা যায় তবে এ অবস্থায় ২৫% এর বেশী পোনা যদি পাত্রের মাঝে জমা হয় তবে ঐ ব্যাচের পোনা খারাপ বা দুর্বল হিসাবে বিবেচনা করতে হবে।

## ২. পরিবহণ পদ্ধতিঃ

আমাদের দেশে বর্তমানে আধুনিক পদ্ধতিতে পলিথিন ব্যাগে চিংড়ির পি,এল পরিবহণ করা হয়ে থাকে। স্বল্প দুরত্বের পরিবহণের জন্য এ্যালুমিনিয়ামের হাড়িতে চিংড়ির পিএল, জুভেনাইল, কার্পের পোনা পরিবহণ করা হয়। তবে সুযোগ থাকলে আধুনিক পদ্ধতিতেই চারা পোনা ও পিএল পরিবহণ অধিক নিরাপদ।

| প্রজাতি ও আকার | পদ্ধতি | পরিবহণ ঘনত্ব | পরিবহণ দুরত্ব |
|---|---|---|---|
| পিএল | আধুনিক | ১৫০০-২০০০/ ব্যাগ | ১২-১৬ঘন্টা |
| | অক্সিজেনসহ প্যাকেট | ১২৫-২০০/ লিটার পানি | ১৮-২৪ ঘন্টা |
| | সনাতন | ২৫০-৫০০/ লিটার পানি | ১-১.৫ ঘন্টা |
| জুভেনাইল | সনাতন | ২৫০-৩০০/২০-২৫ লিটার পানি | ৪-৬ ঘন্টা |
| কার্পের চারা পোনা ( ১-২) ইঞ্চি | সনাতন | ১৫টি / লিটার পানি | ৩-৪ ঘন্টা |
| কার্পের চারা পোনা ( ৪-৬) ইঞ্চি | সনাতন | ১০০টি / ২০-২৫ লিটার পানি | ৩-৪ ঘন্টা |

## ৩. শোধন

পোনা মজুদের সময় পোনার দেহে পরজীবের সংক্রমণ রোধে পোনাকে মজুদের পূর্বে প্রতি লিটার পানিতে ৩-৫ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম পারম্যঙ্গানেট দ্রবণ তৈরী করে শোধনের জন্য ব্যবহার করা যায়। তবে এমন কোন রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করা যাবেনা যা এফডিএ বা অন্য কোন সংস্থা কর্তৃক ব্যবহারে বাধা নিষেধ রয়েছে।

## ৪. পোনা খাপ খাওয়ানো / অভ্যস্থকরণঃ

উচ্চ বা নিম্ন তাপমাত্রা, লবনাক্ততা ও পিএইচ চিংড়ির আকস্মিক মৃত্যুর কারণ হতে পারে অথবা চিংড়িকে পীড়ণ / ক্লেশ সৃষ্টি করে রোগ সংক্রমনের কারণ ঘটাতে পারে। সেহেতু পোনা অভ্যস্থকরণ অতীব জরুরী।

**অভ্যস্থকরণ পদ্ধতিঃ**

ঘেরে / ধান ক্ষেতে ছাড়ার আগে পোনাকে জলাশয়ের পানির লবনাক্ততা, তাপমাত্রা ও পিএইচ এর সহনশীল মাত্রার সাথে অভ্যস্থ করে নিতে হবে। এ জন্য পোনার পরিবহণকৃত পানির সাথে মজুদ এলাকার পানি অদল বদল করতে হবে।

পরিবহন পাত্রটি পুকুরের মধ্যে ১০-১৫ মিনিট ভাসিয়ে রেখে তাপমাত্রা, লবনাক্ততা ও পিএইচ এর পার্থক্য দেখতে হবে। পার্থক্য যদি বেশী থাকে, তবে পুকুরের কিছু পানি পাত্রে এবং পাত্রের কিছু পানি পুকুরে দিতে হবে। এ অবস্থা আধা থেকে এক ঘন্টা পর্যন্ত চলতে পারে। তাড়াহুড়া করলে সমস্ত পোনাই মারা যেতে পারে। যতক্ষণ পোনা আপন ইচ্ছায় পুকুরের পানিতে না যায় ততক্ষণ অপেক্ষা করে পোনাকে নুতন পরিবেশের সাথে অভ্যস্থ করাতে হবে।

# মজুদ ঘনত্ব

পরিমিত হারে মাছ ও চিংড়ি মজুদ করলে-

- অল্প সময়ে মাছ ও চিংড়ি বিক্রয় উপযোগী হয়
- মাছ ও চিংড়ির মৃত্যু হার অনেকাংশে কমে যায়
- মাছ ও চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়
- চিংড়ির স্বজাতিভোজীতা রোধ করে
- অল্প আয়তনের জলাশয় হতে অধিক উৎপাদন পাওয়া যায়

ক্ষেতে উদ্ভিদ প্ল্যাঙ্কটন নিয়ন্ত্রণের জন্য গলদা চিংড়ির সাথে কিছু সাদা মাছ বিশেষ করে কাতলা, সিলভার কার্প, রুইজাতীয় মাছ মজুদ করা যেতে পারে। তবে ধানের সাথে চিংড়ির চাষে সিলভার কার্প ছাড়া সমীচিন নয়। ধান ক্ষেতে চিংড়ি চাষের মজুদ ঘনত্ব নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ-

## ধানের সাথে চিংড়ি

| প্রজাতি | আকার (সে.মি.) | সংখ্যা/শতাংশ |
|---|---|---|
| জুভেনাইল | ৫-৭ | ১০-১৫ |
| কাতলা | ১২-১৫ | ৩-৪ |
| রাজপুটি | ৮-১০ | ৭-৮ |

## বর্ষাপ্লাবিত ধানক্ষেতে (ধানের পরে) চিংড়ি

| প্রজাতি | আকার (সে.মি.) | সংখ্যা/শতাংশ |
|---|---|---|
| জুভেনাইল | ৫-৭ | ১৫-২০ |
| সিলভার কার্প | ১২-১৫ | ৪-৫ |
| কাতলা | ১২-১৫ | ২-৩ |
| রাজপুটি | ৮-১০ | ৪-৫ |
| রুই | ১২-১৫ | ২-৩ |
| গ্রাস কার্প | ১২-১৫ | ১-২ |

উল্লেখ্য যে, কার্প জাতীয় পোনা মজুদের ক্ষেত্রে, আংগুলি আকারের পোনার পরিবর্তে এক শীত পার করা নিজস্ব নার্সারীতে উৎপাদিত কজি আকারের চাপের পোনা মজুদ করা ভাল।

# ধানের যত্ন

- পানি ব্যবস্থাপনা
- জমির আগাছা নিয়ন্ত্রণ
- ধানের রোগ বালাই
- সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা

সব কৃষকেরাই জানেন কিভাবে ধানের যত্ন নিতে হয়। সঠিকভাবে যত্ন নিলে ধান ও মাছের ফলন বাড়ানো যায়। এজন্য যে বিষয়গুলোর উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন তা হলো-

**পানি ব্যবস্থাপনা ঃ-** ধান লাগাবার পর এবং মাছ ছাড়ার আগ পর্যন্ত জমিতে ছিপছিপে অর্থাৎ ১-২ ইঞ্চি পানি রাখা প্রয়োজন। ধান লাগাবার ১৫-২০ দিনের মধ্যে জমিতে ৫-৬ ইঞ্চি পানি ঢুকিয়ে গলদা চিংড়ির পোনা ছাড়তে হবে। এরপর ধান ও চিংড়ি বাড়ার সাথে সাথে পানির পরিমান বাড়াতে হবে। ধানক্ষেতের আইলে উৎস হতে পানি ঢুকানো ও বের করে দেয়ার কল বসাতে হবে। যাতে প্রয়োজনে ক্ষেতে পানি বাড়ানো অথবা কমানো যায়। কলের মুখের কপাট যেন সব সময় টাইট থাকে এবং ছাকনি বা পাটা যেন ছিড়ে কেটে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। পানি ব্যবস্থাপনা বলতে শুধু পানি পরিবর্তন বুঝায় না। সামগ্রিকভাবে পানিতে চিংড়ির বাচাঁ ও বড় হওয়ার জন্য উপযোগী সকল পরিবেশ বজায় রাখাই হলো পানি ব্যবস্থানা। চিংড়ির পোনা মজুদের পর নিয়মিত খামার পর্যবেক্ষন, মাটি ও পানি পরীক্ষা করে পানির গভীরতা, পানিতে প্রাকৃতিক খাবারের পরিমান, পানির পি এইচ, অক্সিজেন, লবনাক্ততা, ক্ষারত্ব, ইত্যাদি প্রত্যাশিত মাত্রায় বজায় রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

## জমি আগাছামুক্তকরণ ঃ

ধানের ফলন বৃদ্ধির জন্য জমি অন্তত প্রথম ৪০ দিন পরিপূর্ন আগাছামুক্ত রাখতে হবে। মাছ ধানক্ষেতের কিছু আগাছা খেয়ে ফেলে আগাছা দমনে সহায়তা করে। এর পরেও আগাছা জন্মাতে পারে। এজন্য যে ব্যবস্থাপনা নেয়া যায় তা হলো-

১. পানির পরিমান বেশী রাখা
২. ভালভাবে জমি তৈরী করা

## সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আই পি এম)

ধানক্ষেতে কীটনাশকের অপপ্রয়োগ আজ সার্বিকভাবে পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া চিংড়ি জলজ পোকা হওয়ায় কীটনাশক স্পর্শকাতর। ধানক্ষেতে গলদা চিংড়ির চাষ করা হলে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার প্রথম চারটি পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। রাসায়নিক পদ্ধতি ব্যবহার করা যাবে না।

ফসলের উপকারী পোকার কোন ক্ষতি না করে কয়েকটি দমন পদ্ধতি প্রয়োগ করে ক্ষতিকর পোকা দমন করাকে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা বলা হয়।

## সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার উপায় ঃ

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার ৪ টি উপায় নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

১. আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি
২. বালাই সহনশীল ধানের জাত
৩. যান্ত্রিক দমন-আলোর ফাঁদ
৪. জৈবিক দমন-পরজীবী পোকা /পাখি

**আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি ঃ**

এই পদ্ধতিতে

- ➢ গভীরভাবে জমি চাষ দেয়া
- ➢ পর্যায়ক্রমে জমি চাষ দেয়া
- ➢ জমিতে সুষম মাতায় সার ব্যবহার
- ➢ সুষ্ঠ সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে
- ➢ রোপণের দূরত্ব বজায় রেখে
- ➢ বালাই সহনশীল ফসলের চাষ করে
- ➢ শস্যাবর্তন করে বালাই দমন করা যায়

**যান্ত্রিক পদ্ধতি ঃ** স্বাভাবিক ভাবে এই পদ্ধতি বেশ কার্যকর। তবে মাঠের সকল কৃষককে একযোগে প্রয়োগ করতে হবে।

- হাতে পোকা ধরে
- পাতার আগা কেটে
- আক্রান্ত গাছ উপরে ফেলে এবং
- আলোর ফাঁদ পেতে বালাই দমন করা যায়

**পোকার যান্ত্রিক দমন ঃ**

হাতে পোকা ধরে ফসলের ক্ষেত হতে পোকামাকড়ের ডিম ও কীড়া সংগ্রহ করে দমন করা যায়। ধান ও আখের ক্ষেতের মাজরা পোকা এভাবে দমন করা যায়। এছাড়া গান্ধি , পামরী, সবুজ পাতা ফড়িং ইত্যাদি পোকাগুলো ধরা জাল দিয়ে সংগ্রহ করে ধ্বংস করা যায়। ধানের পামরি ও সবুজ পাতা ফড়িং হাত জাল দিয়ে সংগ্রহ করে ধ্বংস করা যায়।

**পাতার আগা কাটা ঃ**

কিছু কিছু পোকা যেমন পামরি পোকা ও পাতা মোড়ানো পোকা সাধারণত ধান মাছের পাতার অগ্রভাবে প্রথমে আক্রমণ করে। এমতাবস্থায় গাছের পাতার আগা কেটে মাটিতে পুঁতে বা পুড়িয়ে আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়।

**আলোর ফাঁদ ঃ**

এ পদ্ধতিতে ফাঁদ পেতে কীট পতঙ্গ আকৃষ্ট করে পোকা মারা যায়। রাত্রে জমিতে একটি পাত্রে কেরোসিন বা কীটনাশক মিশ্রিত পানি রেখে ঐ পাত্রের উপর একটি জ্বলন্ত হারিকেন ঝুলিয়ে রাখলে বিভিন্ন ধরনের পোকা হারিকেনের আলোর প্রতি আকৃষ্ট হয়। ফলে পোকা গুলো কেরোসিন বা কীটনাশকের পাত্রে পড়ে মারা যায়। আলোর ফাঁদ পেতে তূর্ণাঙ্গ মাজরা পোকা, শীষ কাটা লেদা পোকা, সবুজ পাতা ফড়িং ও পোকা, সবুজ পাতা ফড়িং ও গান্ধী পোকা দমন করা যায়।

**জৈবিক দমন ঃ**

পরজীবী পোকা এবং পাখি ব্যবহার করে এ পদ্ধতিতে বালাই দমন করা যায়। এগুলো ফসলের ক্ষেত থেকে ক্ষতিকর অন্যান্য পোকা খেয়ে ফেলে। পরজীবী পোকাগুলোর মধ্যে রয়েছে -নেকড়ে মাকড়সা, লিডিবার্ড বিটল, মিরিডবাগ, ঘাস ফড়িং , ড্যামসেল , শালিক, দোয়েল , ময়না ইত্যাদি।

**নেকড়ে মাকড়সা ঃ**

নেকড়ে মাকড়সা বেশির ভাগ সময় ধান গাছের গোড়ায় থাকে। এরা জাল বানায় না; পোকার উপর সরাসরি আক্রমণ করে। পূর্ণ বয়স্ক মাকড়সা নানা প্রকার পোকা ধরে খায়। এগুলোর মধ্যে ধানের মাজরা পোকার মথ অন্যতম।

**ঘাস ফড়িং ঃ**

এরা গাছের পাতা ও শীষে অবস্থান করে। এরা শোষক পোকা। মাজরা পোকা ও গান্ধী পোকার বাচচাকে এর খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে।

**ড্যামসেল মাছি ঃ**

পূর্ণ বয়স্ক ড্যামসেল মাছি পাতার ফাঁকে ফাঁকে উড়ে বেড়ায়। এ মাছি বিভিন্ন ধরণের ফড়িং ও পাতা মোড়ানো পোকা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে।

**লেডিবার্ড বিটল ঃ**

এদের কুমড়া জাতীয় গাছ ও ধানক্ষেতসহ প্রায় ফসলেই দেখা যায়। যে সমস্ত পোকা আস্তে আস্তে চলাফেরা করে তাদেরকেই এরা শিকার করে। এ পোকা শোষক পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা ও মাজরা পোকা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে।

**মিরিডবাগ ঃ**

পাতা ফড়িং ও গাছ ফড়িং দ্বারা আক্রান্ত ধান ক্ষেতে এ পোকা প্রচুর সংখ্যায় দেখা যায়। এরা ধান গাছের পাতার খোলে বা গাছের কান্ডে পাতা ফড়িং এর ডিম খুঁজে বেড়ায় এবং ডিমের ভেতর শুঁড় ঢুকিয়ে ডিমগুলো চুষে খেয়ে ফেলে।

**আশ্রয়স্থল স্থাপনঃ**

জমিতে আশ্রয়স্থল স্থাপন ধান ক্ষেতে চিংড়ি চাষের অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ কাজ। বিশেষ করে খাল ও ডোবায় আশ্রস্থল তৈরী করে দিতে হবে। আটি বাধা বাশের কঞ্চি খাল ও গর্তে স্থাপন করতে হবে। এছাড়া পিভিসি পাইপের কতগুলি টুকরো খাল ও গর্তে বিভিন্ন স্থানে পুতে দেয়া যেতে পারে।

## খাদ্য ব্যবস্থাপনা

**গলদা চিংড়ির প্রাকৃতিক খাবারঃ**

দৈহিক বৃদ্ধি ও বেঁচে থাকার জন্য মাছ ও চিংড়ি ক্ষেতের গর্তে পরিবেশ থেকে সাধারণতঃ যে খাদ্য গ্রহন করে - তাই প্রাকৃতিক খাবার । যেমন, প্রাণী কণা, উদ্ভিদকণা, তলদেশের পোকা-মাকড়, শুক কীট, ছোট ছোট কীটের লার্ভা, তলার কেঁচো, মৃত জৈব পদার্থ ইত্যাদি ।

সার প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষেতে প্রাকৃতিক খাদ্য জন্মানো যায়। ধান ক্ষেতে পরিচর্যাকালীন সার প্রয়োগে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে ধানের প্রয়োজন অনুযায়ী সার প্রয়োগ করতে হবে। আবার পাশাপাশি ধান ও চিংড়ি কারো ক্ষতি না হয় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। জৈব সার হিসাবে হাসঁ মুরগী অথবা গোবর ব্যবহার করা হলে তা কম্পোষ্ট করে ব্যবহার করতে হবে।

প্রানী মাত্রেই বেঁচে থাকা ও বড় হওয়ার জন্য খাবার প্রয়োজন। চিংড়িও খাবার খেয়েই বড় হয়। তাই, মজুদের পর ধান ক্ষেতে খাবার যোগান দেয়া অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ বিষয়। খাবার যোগানের বিষয়টি দুইভাবে নিশ্চিত করা যায়। চিংড়ির ক্ষেত্রে পিলেট খাদ্যই উপযুক্ত। পোনা মজুদের প্রথম দুই মাস মাছের জন্য প্রস্তুত পিলেটে খাদ্য দেয়া যায়। পরে খামারে তৈরী খাবার পুকুরের বিভিন্ন স্থানে ফিডিং ট্রেতে করে দেয়া যায়। ফিডিং ট্রে পরীক্ষা করে খাদ্যের পরিমাণ ও মাত্রা নির্ধারণ করতে হয়। ক্ষেতের পানি দুষিত করার একটি প্রধান কারণ হলো অতিরিক্ত খাদ্য প্রয়োগ। ফলে প্রথম থেকেই সঠিক মাত্রায় খাদ্য প্রয়োগ করা উচিত। প্রথম অবস্থায় খামারে প্রস্তুত খাবার মোট চিংড়ির ওজনের ৫% হারে এবং পিলেট খাবার হলে দেহ ওজনের ৩% হারে খাদ্য দিতে হবে। নিম্নে বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে গলদা চিংড়ির সম্পুরক খাদ্যের ফর্মুলা দেওয়া হলো ঃ-

### গলদা চিংড়ির সম্পুরক খাবারঃ

চিংড়ি সর্বভূক প্রাণী। এদের মাঝে স্বজাতভোজী স্বভাব থাকার কারণে খাদ্যের অভাব দেখা দিলেই সবল চিংড়ি দুর্বল চিংড়িকে ধরে খায়। চিংড়ির স্বাভাবিক বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার জন্য প্রাকৃতিক খাদ্যের পর্যাপ্ততার পাশাপাশি পুকুরে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উৎস অনুযায়ী সেগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

**উদ্ভিদজাতঃ**

চালের পলিস কুড়া, গমের ভুষি, চালের খুদ, আটা, চিটাগুড়, সরিষার খৈল, তিলের খৈল, ক্ষুদিপানা, কুটি পানা, নরম ঘাস, শীতকালীন শাক-সবজি, বচি কলার পাতা, পেঁপে পাতা, আলুর পাতা, সজনে পাতা, নেপিয়ার ঘাস ইত্যাদি।

প্রাণীজাতঃ পিলেট ফিড, ফিসমিল, চিংড়ির মাথার গুড়া, কাঁকড়ার গুড়া, রেশম কীট, শামুকের মাংস, গবাদি পশুর রক্ত, হাঁস- মুরগীর নাড়ি, ভূড়ি ইত্যাদি।

### খাদ্য নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়ঃ

আমাদের দেশে চাষীরা সম্পূরক খাবার হিসেবে প্রধানত খৈল ও কুড়া ব্যবহার করে থাকেন। এ গুলো ছাড়াওপ্রায় সারা দেশেই চাষীদের এমন কিছু খাদ্য উপকরণ ব্যবহার করতে দেখা যায় যাদের কিছু কিছু আর্থিকভাবে লাভজনক নয়, এমন কি কিছু কিছু পুকুরের পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মাছ ও চিংড়ি অধিক উৎপাদন। সে কারণে পুকুরে প্রয়োগের জন্য খাদ্য নির্বাচনে বেশ কিছু বিষয় বিবেচনা করা উচিত। নীচে লাভজনকভাবে মাছ ও চিংড়ি চাষের জন্য খাদ্য নির্বাচনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় উল্লেখ করা হলো-

- উপাদানসমূহের সহজ লভ্যতা
- চাষীর আর্থিক সংগতি
- উপকরণসমূহের মূল্য
- মাছ ও চিংড়ির পুষ্টি চাহিদা
- মাছ ও চিংড়ির পছন্দনীয়
- উচ্চ খাদ্য পরিবর্তন হার

**মাছ ও চিংড়ির পুষ্টি চাহিদা ঃ**

মাছ ও চিংড়ির পুষ্টি চাহিদা বয়স ও প্রজাতির উপর নির্ভর করে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে উৎপাদন পুকুরে রুই জাতীয় মাছ ও চিংড়ির খাদ্যে আমিষের চাহিদা যথাক্রমে ৩৫-৪০% এবং ৪০-৪৫%। অতএব ভালো উৎপাদন পেতে হলে মাছ ও চিংড়ি খাদ্যে উল্লেখিত মাত্রার আমিষ থাকা বাঞ্চনীয়। কিন্তু প্রাকৃতিক খাদ্য থেকে মাছ ও চিংড়ি মোট চাহিদার ৫- ১৫% আমিষ পেয়ে থাকে। সেই বিবেচনায় তৈরী খাদ্যে ২৫-৩০% আমিষ থাকলেই খাদ্যকে সুষম হিসেবে গ্রহন করা যায়।

**খাদ্য তৈরীতে উপকরণ ব্যবহারের অনুপাতঃ**

মাছ ও চিংড়ির খাদ্য তৈরীর জন্য কম মূল্যের উৎকৃষ্টমানের খাদ্য উপকরণ এমনভাবে বেছে নিতে হবে যাতে উহাদের পুষ্টি চাহিদা পূরন হয়, খাদ্যের মান বজায় থাকে এবং খাদ্য প্রয়োগ বাবদ পুঁজি বিনিয়োগ কম হয়।

খাদ্য তৈরীতে উপকরণ ব্যবহারের নমুনা উল্লেখ করা হলো-ঃ

<u>নমুনা - ১</u>

| | |
|---|---|
| শুটকী মাছের গুড়া | - ৫০% |
| সয়াবিন তৈল | - ১০% |
| সরিষার খৈল | -১০% |
| আটা | -১০% |
| চাউলের কুড়া | -২০% |

<u>নমুনা - ২</u>

| | |
|---|---|
| শামুকের মাংস | - ৩০% |
| সরিষার খৈল | - ৫০% |
| চাউলের কুড়া | - ২০% |

## সম্পূরক খাদ্য তৈরী

বিভিন্ন ধরনের উপকরণ ব্যবহার করে খুব সহজেই মাছ ও গলদা চিংড়ির খাদ্য তৈরী করা যায়। চাষী নিজের হাতেই তা করতে পারেন। সম্ভব হলে মিক্সিং মেশিন ব্যবহার করেও খাদ্য তৈরী করা যেতে পারে। নীচে মাছ ও চিংড়ি চাষের পুকুরে প্রয়োগের জন্য মিশ্র খাদ্য তৈরীর পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

- চালের কুঁড়া, ভুষি ও ফিসমিল ভালভাবে চালুনি করে নিতে হবে

- চালের খুদ ব্যবহার করা হলে সিদ্ধ করে নিতে হবে
- সমস্ত উপকরণগুলো একটি পাত্রে নিয়ে ভালভাবে মেশাতে হবে
- আটা পরিমান মত পানিতে ফুটিয়ে আঠালো পদার্থ তৈরী করতে হবে
- উপকরণগুলো আঠালো পদার্থ দ্বারা মেখে কাঁই তৈরী করে ছোট ছোট বল বানাতে হবে

### সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগঃ

মাছ দিনের বেলায় খাদ্য গ্রহণ করে। অপর দিকে গলদা চিংড়ি নিশাচর। দিনের আলোর চেয়ে এরা অন্ধকারে চলাচল ও খাদ্য গ্রহন করতে পছন্দ করে। সে জন্যে কার্প-চিংড়ি মিশ্রচাষের ধানক্ষেতে পুকরে প্রতি দিনের প্রয়োজনীয় খাবার দু'ভাগে ভাগ করে এক ভাগ সকাল ৬ টার আগে এবং আরেকবার সন্ধ্যা ৬ টার পরে প্রয়োগ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেকবার প্রয়োগের পূর্বে খাবারকে আবার দু'ভাগ করে অর্ধেক খাদ্যদানীতে এবং বাকী অর্ধেক পুকুরের কয়েকটি জায়গা পাটকাঠি দ্বারা চিহ্নিত করে সেখানে দিতে হবে। উল্লেখ্য যে চিংড়ির জন্য খাদ্য দেয়ার সময় গর্ত বা নালার তলদেশ থেকে ০.৫ ফুট উপরে খাদ্যদানী স্থাপন করতে হবে।

### খাদ্যদানী

খাদ্যদানী (ট্রে) তে খাবার দিলে খরচ বাঁচে এবং খাদ্যের ব্যবহার যথার্থ হয়। তা ছাড়া খাদ্যের পরিমাপ করাও সহজ হয়।

### খাদ্যদানী তৈরীঃ

খাদ্যদানীর আকার ১ বর্গ মিটার অথবা ৮০ সেমি হতে পারে। বাঁশ বা কাঠের ফ্রেমের নীচে মশারীর কাপড় লাগিয়ে ধর্ম জালের মতো করে তা তৈরী করা যায়। ফ্রেমটির উচ্চতা ১০ সেমি রাখা উচিত। ৩০ শতাংশ ক্ষেতে ২টি, ৬০ শতাংশ ৪টি এবং ১০০ শতাংশে ৬ টি খাদ্যদানী স্থাপন করলেই চলে। মূলতঃ ক্ষেতের আয়তনের উপর নির্ভর করেই খাদ্যদানীর আকার ও সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে।

### খাদ্য প্রয়োগের সতর্কতাঃ

প্রতিদিন একই সময়ে একই জায়গায় খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। মাঝে মাঝে খাদ্য দানী উঠিয়ে খাবার গ্রহনের পরিমান যাচাইপূর্বক প্রয়োগ মাত্রা পুনঃনির্ধারণ করতে হবে। পানি অতিরিক্ত সবুজ হলে খাদ্যের প্রয়োগ মাত্রা কমিয়ে দিতে হবে বা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে।

## চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

আমাদের দেশে চাষীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা, উপকরণের সহজপ্রাপ্যতা ও চিকিৎসা পদ্ধতির জটিলতার কারণে চিংড়ির রোগ চিকিৎসা চাষীদের পক্ষে শুধু কষ্ট সাধ্যই নয় অনেকটা অসম্ভব ও বটে। সে কারণে মনে রাখা দরকার রোগের চিকিৎসার চেয়ে রোগ প্রতিরোধই অধিক শ্রেয়। চাষের শুরুতেই নীচের পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করলে চিংড়ির রোগ চিকিৎসার মত বিরক্তিকর বিষয় পরিহার করা যেতে পারে

- ঘের/গর্ত পরিমিত সূর্যালোকের ব্যবস্থা করা
- ঘের/গত শুকিয়ে নিয়মিত চুন দেয়া
- কোন অবস্থাতেই অতিরিক্ত চারা পোনা বা জুভেনাইল মজুদ না করা
- বাইরের অবাঞ্চিত প্রাণী ও পানি পুকুরে ঢুকতে না দেয়া
- তলায় অতিরিক্ত কাদা না রাখা
- পরিমিত সার ও খাদ্য সরবরাহ করা
- ঘের/গত ঘন ঘন জাল না ফেলা
- ঘের/গত ঘোলাত্ব সৃষ্টির উৎস বন্ধ করা

## ধানের পরে চিংড়ি চাষঃ

ধানের পরে চিংড়ি চাষ ধানের সাথে চিংড়ি এর মতই। পার্থক্য শুধু যেহেতু জমিতে ধান থাকেনা সেহেতু প্রাকৃতিক খাবার তৈরীর জন্য পুকুরের মত পরিমিত মাত্রায় সার প্রয়োগ করা যায়। পোনা মজুদের পূর্বে ধানের খড় ও অন্যান্য পচনশীল দ্রব্যাদি ভালভাবে পরিস্কার করে নিতে হবে। পানির গভীরতা ও আগাছা মুক্ত থাকায় সাদা মাছ হিসেবে সিলভার কার্প, কাতলা, রুই ও গ্রাস কার্প মাছের পোনা মজুদ করা যায়।

- **রাক্ষুসে প্রাণীর উপদ্রবঃ**

  ধানক্ষেতে রাক্ষুসে মাছ সহ অন্যান্য জলজ প্রানির উপদ্রব একটি বড় সমস্যা । বাহির হতে যাতে এসব প্রাণী খামারে না ঢুকতে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এজন্য পানি প্রবেশ পথে ভালো ছাকনী স্থাপন করতে হবে। তাছাড়া নেট জাল দিয়ে খামার ঘিরে দিলে এর উপদ্রব হতে অনেকটা রেহাই পাওয়া যায়।

- **ইদুর ও কাকড়ার উপদ্রব ঃ**

  ইদুর ও কাকড়ার উপদ্রব চিংড়ি চাষে একটি বড় সমস্যা। এই দুটি প্রাণী খামারের বাঁধে গর্ত করে। এতে খামারের পানি বাইরে চলে যায়। আবার বাহির হতে পচাঁ পানি খামারে প্রবেশ করতে পারে। এতে চাষে নানান সমস্যা হতে পারে। অতএব ধান ক্ষেতে গলদা চাষের ক্ষেত্রে দুটি প্রাণী নিয়ন্ত্রন করতে হবে।

- **নিয়ন্ত্রন ঃ** ইদুর দমনের নানা পদ্ধতি রয়েছে। গর্তে মরিচের ধোয়া দিয়ে ইদুর গর্ত হতে বের করে মেরে ফেলা যায়। ইদুর মারা কল পেতে ইদুর নিয়ন্ত্রন করা যায় ইদুর মারার কল আইলে এবং ছোট কলার ভেলায় পানিতেও পাতা যায়। বরশী দিয়ে কাকড়া ধরা যায় পুকুর প্রস্তুতির সময় ভাল করে এসব প্রানী মেরে ফেলতে হবে। এছাড়া জমি জাল দিয়ে ঘিরে দিলেও এদুটি প্রানী বহুলাংশে নিয়ন্ত্রন করা যায়।

- **চিংড়ি বের হওয়া বা চুরি হওয়া**

  চিংড়ির দাম বেশী হওয়ায় চুরি হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী। এক্ষেত্রে পাহাড়ার কোন বিকল্প নেই।কাছাকাছি একাধিক ঘের/ খামার হলে সকলে মিলে পাহাড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এতে পাহড়া ব্যয় কমে আসবে। পাশাপাশি ক্ষেতের ডোবা ও খালে বাঁশের কঞ্চি পুতে দিতে হবে। পরিকল্পিত খামার হলে কাটা তার দিয়ে বেড়া দেয়া যেতে পারে।

**গলদা চিংড়ি কিনারে চলে আসা ঃ**

চিংড়ি খোলসযুক্ত প্রাণী এবং খোলস পরিবর্তন করে বড় হয় । সাধারনতঃ অমাবস্যা পূর্নিমায় এরা খোলস বদলায় । তাছাড়া এর যৌন পরিপক্কতার সাথে অমাবশ্যা পূর্নিমার গোনের একটা সম্পর্ক বিদ্যমান । এসময় এরা কিনারে চলে আসতে পারে । আবার কোন কারনে পানিতে অক্সিজেন কমে গেলে অথবা পানি দুষিত হলে কিংবা অন্য যে কোন কারণে ক্ষেতের পানি চিংড়ির টিকে থাকার অনুপযোগী হয়ে পড়লে চিংড়ি কিনারে চলে আসতে পারে । অনেক সময় পাড়ে উঠে আসতে দেখা যায় ।

**প্রতিকার ঃ** খামারের মাটি ও পানির প্রত্যাশিত গুণাগুণ বজায় রাখতে হবে । এ জন্য মাটি ও পানির গুণাগুণ মাঝে মাঝে পরীক্ষা করতে হবে । পানিতে যাতে অক্সিজেন ঘাটতি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে । ঘাটতি দেখা দিলে বিশেষ করে ডোবায় ও খালে ঝর্ণা সৃষ্টির ব্যবস্থা করতে হবে । এছাড়া খামারের আইল বা পাড় নেট দিয়ে ঘিরে দেয়া যেতে পারে ।

## চিংড়ি আহরণ, আহরণত্তোর পরিচর্য্যা ও বাজারজাতকরণঃ

খাবার বা বিক্রির উদ্দেশ্যে ধানক্ষেত/ ঘের হতে মাছ ও চিংড়ি ধরাই হচ্ছে আহরণ । লাভজনক ভাবে মাছ ও চিংড়ি চাষের জন্য সঠিক পদ্ধতিতে আহরণ অপরিহার্য্য । ধান ক্ষেত বা ঘের হতে দুই ভাবে মাছ ও চিংড়ি আহরণ করা যায় । ঃ-

১. আংশিক আহরণ

২. সম্পূর্ণ আহরণ

প্রত্যেক ঘের বা ধানক্ষেতে একটি নির্দিষ্ট ধারণ ক্ষমতা আছে । ঘের / ধান ক্ষেতের ধারণ ক্ষমতা পুর্ণ হওয়ার আগেই যদি বড় আকারের মাছ ও চিংড়ি ধরে ফেলা যায় তবে বাকিগুলো বড় হওয়ার সুযোগ পায় । এতে সার্বিক উৎপাদন বেশী হয় । কাজেই সুযোগ পেলে চিংড়ির আংশিক আহরণই সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত । কাতলা, সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প ইত্যাদি ৭৫০ গ্রাম, রুই ২৫০ গ্রাম ও চিংড়ি ৫০ গ্রাম ওজন হলেই আহরণ করা উচিত ।

### আহরণ পদ্ধতিঃ

জলাশয়ের আয়তন ও আহরণের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত তিন ধরণের আহরণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় ।

১. বেড় জাল পদ্ধতিঃ বড় আকারের ঘেরে / ধান ক্ষেতে ১/২ ইঞ্চি ফাঁসের বেড় জাল ব্যবহার করে মাছ / চিংড়ি আহরণ করা যায় ।

২. ঝাকি জাল পদ্ধতিঃ স্বল্প পরিমাণ মাছ ও চিংড়ি ধরতে ঝাকি জালই উত্তম । ঝাকি জাল ব্যবহারের ২০-২৫ দিন আগে নির্দিষ্ট স্থানে খাবার প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায় ।

৩. পানি নিষ্কাশন পদ্ধতিঃ চিংড়ি আহরণের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি সবচেয়ে কার্যকর । ক্ষেতের পানি কমিয়ে সমস্ত মাছ গর্তে এনে আংশিক বা সম্পূর্ণ আহরণ করা যেতে পারে ।

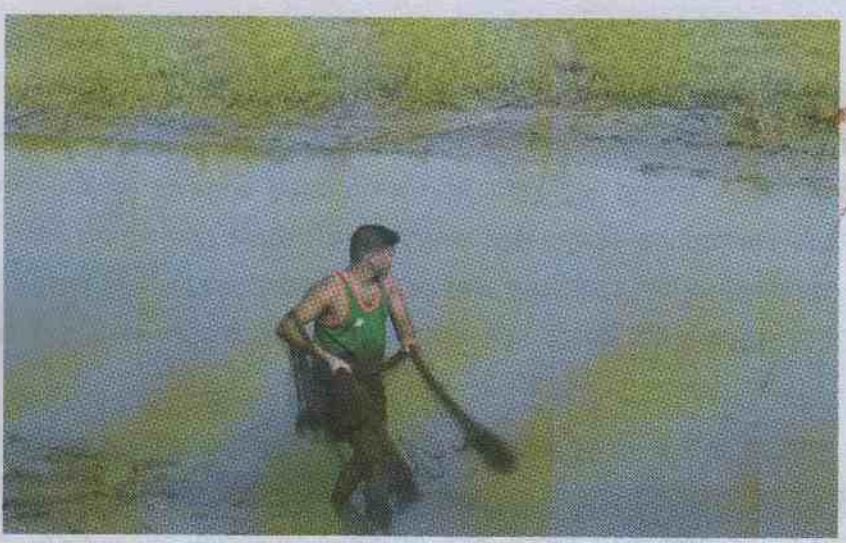

### আহরণত্তোর পরিচর্য্যা ঃ

- আহরণকৃত মাছ ও চিংড়ি পরিস্কার করে ধোয়া ।
- চিংড়ির গ্রেডিং করা ।
- প্লাষ্টিকের বালতি বা ঝুড়িতে বরফ মিশ্রিত করে চিংড়ি বাজারজাত করা ( চিংড়ি ঃ বরফ= ১ঃ১) ।
- যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিকটস্থ ডিপোতে নিয়ে বিক্রি করা ।
- পরিবহণকালে ছায়ার ব্যবস্থা করা ।
- মাছ/ চিংড়ি আঘাত প্রাপ্ত না হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে ।

### আহরণের সময়ঃ

- ঠান্ডা ও পরিস্কার আবহাওয়ায় মাছ ধরা উচিত ।
- বিশেষ করে ভোর বেলায় মাছ ও চিংড়ি ধরা উত্তম ।
- স্থানীয় বাজারের সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে মাছ ধরা উচিত ।

## ধানক্ষেতে গলদা চিংড়ি চাষে অনুসরনীয় নীতি ঃ

১ । **খামারের অবস্থান:** ধান ক্ষেতে চিংড়ি চাষের জন্য জমি নির্বাচনের সময় চাষীকে খেয়াল রাখতে হবে যে, ঐ এলাকায় কি ধরনের ধান চাষ হয় । চাষে ব্যাপক এবং মারাত্মক কোন কীটনাশক ব্যবহৃত হয় কি না । যদি করা হয়ে থাকে তবে এখন থেকে তা বাদ দিয়ে আইপিএম এর মাধ্যমে ধানের বালাই দমনে এলাকার সকল চাষীকে রাজী করাতে হবে ।

আশেপাশের জমিতেও যাতে কীটনাশক ব্যবহার না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে । এ সমস্ত ক্ষতিকর রাসয়নিকের অবশেষ চিংড়ির বৃদ্ধিতে ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে এবং উৎপাদিত চিংড়িকে ভোক্তার জন্য বিপদজনক করে তোলে ।

গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগীর খামার, শিল্প ও কল-কারখানার বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং পয়:বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা, ইত্যাদির মত মারাত্মক উৎস সংলগ্ন স্থানে চিংড়ি খামার তৈরী না করাই ভালো ।

যদি কোন চিংড়ি খামার কৃষি ক্ষেত, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগীর খামার, জনবসতি বা বস্তির সন্নিকটে অবস্থিত হয় তাহলে চাষীকে চিংড়ি খামারের উপর স্থাপনাগুলির ক্ষতিকর প্রভাবের বিষয়টি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও মনিটর করে স্থান নির্বাচনের বিষয়টি স্থির করতে হবে।

২। **চাষে ব্যবহৃত পানি:** চিংড়ি খামারের পানির মান চিংড়ির স্বাস্থ্য, গুনগতমান এবং খাদ্য-নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। দূষিত পানি যেমন চিংড়ির মৃত্যুর কারণ হয় তেমনি তা চিংড়ির বৃদ্ধিতেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। দূষিত পানি উৎপাদিত চিংড়ির দেহে ক্ষতিকর রাসায়নিকের অবশেষ (রেসিডিউ) জমা করে ও ক্ষতিকর জীবাণুর দূষণ ঘটায়। পরিশেষে এই অবশেষ এবং ক্ষতিকর জীবাণু ভোক্তার স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হ্যাজার্ড হিসাবে দেখা দেয়। পানি দূষণের ক্ষেত্রে যে কারণগুলি প্রায়শই দেখা যায় সেগুলি হ'ল- ভারী ধাতুসমূহ (হেভি মেটালস), বিভিন্ন কীটনাশক এবং কৃষি-রাসায়নিক দ্রব্য, শিল্প কারখানার রাসায়নিক বর্জ্য, কলিফর্ম ও স্যাল্‌মোনেলা জীবাণু এবং ভারী ধাতু। ধানক্ষেতে মাছ চাষের ক্ষেত্রে পানি এবং পানির উৎস সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।

ক্ষেতে ধানের পাতা কিংবা অন্য যে কোন পচন দ্বারা পানি যাতে দুষন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

যে উৎস হতে পানি আসছে সেই উৎসের পানি যাতে পচা বা অন্য কোন দুষন দ্বারা দুষিত না সেদিকে নজর দিতে হবে।

কলকারখানা, সিটি ও ক্লিনিক্যাল বর্জ্য যোগ হয় এমন কোন উৎসের পানি চাষের খামারে ব্যবহার করা যাবে না।

চিংড়ি চাষে ব্যবহৃত হয় এমন কোন পানির উৎসে কলকারখানা, সিটি ও ক্লিনিক্যাল বর্জ্য যোগ করা যাবে না অথবা এক্ষেত্রে সকলে মিলে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

৩। **পরিবেশ:** চিংড়ি খামারের আশ পাশের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও ভাল অবস্থায় রাখলে সরাসরি আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে যেমন রক্ষা পাওয়া যায় তেমনি নিরাপত্তা সম্পর্কিত অনেক বিপদের সম্ভাবনাকে কমিয়ে আনা যায়। ধান ক্ষেতে চিংড়ি খামারে বন্য প্রাণীর বিচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ইঁদুর, ছুঁচো, বেজি, ভোঁদড়, বিভিন্ন পাখী এবং অন্যান্য বন্য প্রাণীর বিচরণ প্রতিরোধ করতে হবে। কেন না এতে বিভিন্ন ক্ষতিকর জীবাণু (যেমন-স্যালমোনেলা, ই.কলি, ইত্যাদি) সংক্রমনের ঝুঁকিপূর্ন উৎস্য হতে পারে। খাদ্য তৈরী, প্রস্তুত এবং সংরক্ষণ এলাকায় এ সমস্ত প্রাণীর চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা খুবই জরুরী।

৪। **স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস/হাইজিন প্র্যাকটিস:** চিংড়ি খামারে স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস বলতে মূলত: মানুষের মল ও অন্যান্য ক্ষতিকর কার্যকলাপ থেকে উদ্ভূত রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু নিয়ন্ত্রণ বা পশু-পাখীর মল ও বর্জ্যের সার হিসাবে ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করা বুঝায়। এ ক্ষেত্রে বিপদজনক বিষয়টি হ'ল এই যে, মানুষ, গরু ছাগলও হাসমুরগী ইত্যাদি প্রাণীর বর্জ্য বা মল মারাত্মক রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু বহন করে যা চিংড়ির খামারে বিস্তার লাভ করতে পারে। চিংড়ি খামারে, বিশেষকরে জলাশয়ে এবং সংলগ্ন এলাকায় মল মুত্র ত্যাগে স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস মেনে চললে পানিতে মল-মূত্রের দূষণকে ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা সম্ভব হয়। তাই চিংড়ির পুকুরে উল্লেখিত উৎসের জৈব সার ব্যবহার না করাই উত্তম।

৫। **চিংড়ির খাদ্য সম্পর্কিত যত্ন ও সতর্কতা:** চিংড়ি একটি দামী পণ্য হওয়ায় চাষ পর্যায়ে তার যথাযথ দৈহিক বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য বাড়তি খাবার দেয়া খুবই জরুরী। তবে অধিক বৃদ্ধির প্রত্যাশায় চাষী অনেক সময় সঠিক নিয়ম অনুসরণ না করেই খাবার ব্যবহার করে থাকেন। এর ফলে যেমন নিম্ন মানের খাবার ব্যবহার করা হয়ে থাকে তেমনি সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়টি অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে। নিম্ন মানের খাদ্য এবং খাদ্যের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার কেবল চিংড়ির জন্য ক্ষতিকর নয় তা ভোক্তার স্বাস্থ্য ঝুঁকিও তৈরী করে। স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য বিভিন্ন কাঁচা খাবার, যেমন- শামুক ও ঝিনুকের মাংস, মরা মাছ, মরা প্রাণীর মাংস ও নাড়ী-ভূড়ী, স্কুইড, কাঁকড়া চূর্ন, ইত্যাদি দেয়া হয়। এ ধরণের খাবার ব্যবহারে চাষীরা বেশী উৎসাহী, কারণ তাতে খরচ কম। কিন্তু, বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এ ধরণের কাচা খাবার বিভিন্ন ধরণের রোগ-জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত থাকে, যেমন- স্যালমোনেলা, ভি.কলেরা, ই.কলি, ইত্যাদি খাবারের মাধ্যমে তা খুব সহজেই চিংড়িতে সংক্রমিত হয়। তাছাড়া এ ধরনের কাঁচা খাবার খুব সহজেই পানিকে দূষিত করে পানির স্বাভাবিক গুণাগুণকে নষ্ট করে ফেলে। এর ফলে চিংড়ির ব্যাপক মড়কও দেখা দিতে পারে। তবে এ সমস্ত কাঁচা খাবার ভালভাবে সিদ্ধ করে ব্যবহার করলে সম্ভাব্য রোগ-জীবাণু সংক্রমন রোধ করা সম্ভব হবে।

৬। **ঔষধের ব্যবহার:** প্রাণীকুলের রোগ নিরাময়ের জন্য বিভিন্ন ঔষধের আবিষ্কার হলেও এর অপব্যবহার আবার প্রাণীর জন্য মারাত্মক অবস্থা সৃষ্টি করে। উদাহরণ হিসাবে চাষ পর্যায়ে বিভিন্ন এ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে। এ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার চাষ ক্ষেত্রে চিংড়ির রোগ নিরাময়ে সহায়ক হলেও এর অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার পরিশেষে চাষীর জন্য বিপদ ডেকে আনে। অনিয়ন্ত্রিত ও দীর্ঘ ব্যবহার চিংড়ির দেহে এ্যান্টিবায়োটিকের অবশেষ (রেসিডিউ) জমা করে এবং চিংড়ির মাধ্যমে তা মানুষের শরীরে প্রবেশ করে বিভিন্ন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। চাষ পর্যায়ে অতীতে ব্যবহৃত কতিপয় এ্যান্টিবায়োটিক মানবদেহে ক্যানসারের মত মারাত্মক রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী বলে প্রমানিত হওয়ায় বর্তমানে সেগুলির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া চাষ পর্যায়ে অনুমোদিত এ্যান্টিবায়োটিক ও অন্যান্য ঔষধের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আইনও জারী করা হয়েছে। চাষ পর্যায়ে ঔষধের নিয়ন্ত্রণহীন ব্যবহার চাষীর জন্য উপকারের পরিবর্তে ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়ায় পর্যায়ে ঔষধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে উল্লেখিত দেশসমূহে তার অনুমোদনের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা অপরিহার্য। ধানক্ষেতে চিংড়ি চাষে এধরনের কোন অন অনুনোমোদিত এন্টিবায়োটিক, ঔষধ বা রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা যাবে না।

৭। **চিংড়ির আহরণপূর্ব মূল্যায়ন:** চাষের সময় সাধারণত: প্রত্যেক চাষী নির্দিষ্ট সময় অন্তর চিংড়ির আকার, পরিমান এবং স্বাস্থ্যগত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে থাকেন। এটি এক ধরণের রুটিন চেক, যা উত্তম চাষ ব্যবস্থাপনার জন্য খুবই প্রয়োজন। চাষ পর্যায়ে চিংড়ি ধরার আগে এই রুটিন চেক চিংড়ির গুনগত মান ও খাদ্য-নিরাপত্তার বিষয়টি মূল্যায়নের একটি বাড়তি সুযোগ তৈরী করে দেয়। খামারে উৎপাদিত চিংড়ির গুনগত মান এবং খাদ্য-নিরাপত্তার অবস্থা কাংখিত স্ট্যান্ডার্ডে অর্জন করা সম্ভব হয়েছে কিনা চিংড়ি ধরার পূর্বে সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া খুবই জরুরী। এ জন্য চিংড়ি আহরণের ৭-১০ দিন আগে একটি আহরণ-পূর্ব পরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা উচিৎ। কারণ, আহরণের পর চিংড়ির গুণগত মান এবং খাদ্য-নিরাপত্তা সম্পর্কিত ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তখন চাষী বা প্রক্রিয়াকরণকারীর পক্ষে আর তেমন কিছু করার সুযোগ থাকেনা। পক্ষান্তরে, আহরণ-পূর্ব পরীক্ষায় বা মূল্যায়নে ত্রুটি ধরা পড়লে পুকুরে প্রয়োজনীয় সংশোধন ব্যবস্থা প্রয়োগ করে সম্ভাব্য সমস্যা থেকে পরিত্রান পাওয়া যেতে পারে।

৮। **আহরণের সময় অনুসরনীয় প্র্যাকটিসসমূহঃ** খামারে চাষকৃত চিংড়ি আহরণের কাজটি এমন কতগুলি ধাপের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয় যা উৎপাদিত চূড়ান্ত পণ্যের গুণগত মান ও খাদ্য-নিরাপত্তাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করতে পারে। গুরুত্বপূর্ন ধাপগুলি হ'ল:

- খাবার কমিয়ে দেয়া/বন্ধ করে দেয়া।
- আহরণের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, উপকরণ এবং কর্মী প্রস্তুত রাখা।
- আহরণ। এবং
- হ্যান্ডলিং ও পরিবহন

• জীবাণু সংক্রমন প্রতিরোধ এবং গুনগত মান সংরক্ষণের জন্য উল্লেখিত ধাপগুলির নির্ধারিত কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে। আহরণ ও বিক্রয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য চাষীর উচিৎ সম্ভাব্য ক্রেতার সাথে আলোচনা সাপেক্ষে চিংড়ি আহরণের দিন-ক্ষন ঠিক করা। চিংড়ি ধরার কাজটি সাধারণতঃ নোংরা অবস্থায় হলেও চিংড়ি রাখার কাজে ব্যবহৃত পাত্রগুলিকে ভালভাবে পরিষ্কার ও জীবাণু মুক্ত করে নিতে হবে। কারণ, নোংরা পাত্রের গায়ে লেগে থাকা ময়লা ও পূর্বের মরা চিংড়ি থেকে নতুন চিংড়িতে জীবাণু সংক্রমন ঘটতে পারে। চিংড়ি রাখা এবং পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত সকল বাস্কেট, টাব ও অন্যান্য পাত্রকে যথাযথভাবে পরিষ্কার এবং জীবাণু মুক্ত করতে হবে। চিংড়ি ধরার কাজে যে সমস্ত ব্যক্তিকে নিয়োজিত করা হবে তাদেরকে অবশ্যই সুস্বাস্থ্যের অবস্থায় (রোগ মুক্ত) থাকতে হবে। বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হাতে কোন কাটা ঘা বা দূষিত ক্ষত থাকবে না। ধরার পর সরাসরি হাত দিয়ে চিংড়ি হ্যান্ডলিং না করে দস্তানা (হ্যান্ড গ্লোভস্) পরে হ্যান্ডলিং করা সবচেয়ে ভাল।

**পরিচর্যা এবং পরিবহনের জন্য প্রস্তুতি:** পরিবহনের পূর্বে চিংড়িকে যথাযথভাবে প্রস্তুত করার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ন। কারণ, এর পর থেকে প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় পৌছানো পর্যন্ত সময়ের মধ্যে গুনগত মানের প্রকৃত অবনতি শুরু হয়। তাই প্রস্তুতির এই পর্যায়ে অনেক বিষয়কে বিবেচনায় নিতে হয়। এ পর্যায়ে চাষীকে যা করতে হবে :

- ইতোপূর্বে সাময়িকভাবে সংরক্ষিত চিংড়িকে পানযোগ্য পানি দিয়ে তৈরী কুচি বরফের মধ্যে রাখতে হবে। পরিষ্কার ও জীবাণু মুক্ত প্লাষ্টিকের বাক্সের মধ্যে প্রথমে বরফের একটি স্তর, তারপর চিংড়ির একটি স্তর, তারপর আবার বরফ- এভাবে সাজাতে হবে।
- পরিবহনে কত সময় লাগবে এবং পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা কত তা বিবেচনা করে বরফ ও চিংড়ির অনুপাত নির্ধারণ করতে হবে। সাধারণতঃ চিংড়ি ও বরফের অনুপাত হবে ১:১ । দিনের তাপমাত্রা ও দূরত্বের বিবেচনায় প্রয়োজনে বরফের পরিমান বৃদ্ধি করতে হবে।
- পরিবহনের সময় চিংড়িতে যেন চাপ না লাগে সেজন্য উপযুক্ত ডিজাইনের শক্ত প্লাষ্টিকের বাক্সে চিংড়ি পরিবহন করতে হবে। উপযুক্ত ডিজাইনের বাক্স উপর্যুপরি সাজিয়ে রাখলেও নিচের বাক্সের চিংড়িতে একটুও চাপ পড়বে না। পক্ষান্তরে, বাস্কেটের উপর বাস্কেট রাখলে উপরের বাস্কেটের চাপে নিচের বাস্কেটের চিংড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
- ইনস্যুলেটেড (তাপ নিরোধক) ট্রাকে বা ভ্যানে করে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি চিংড়িকে ডিপো/আড়তে/সার্ভিস সেন্টারে/সরাসরি প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় পরিবহনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- পরিবহনের পর পরিবহন যান ও চিংড়ির বাক্স উপযুক্ত সাবান, ডিটারজেন্ট ও জীবাণুনাশক দিয়ে ভাল করে ধুয়ে শুকিয়ে ফেলতে হবে।

## এক নজরে উত্তম চাষ পদ্ধতি অনুসরণঃ

- ☞ বাঁধের উপরিভাগ অন্তত একজন লোক চলাচল করতে পারে এমন প্রশস্ত, শক্ত, মজবুত ও ঢালু করে তৈরী করতে হবে।
- ☞ খাল এবং গর্ত ঢালু করে কাটতে হবে।
- ☞ পোনা আহরণ, পরিবহণ ও পোনা ছাড়ার কাজগুলি পীড়ন বা ধকল মুক্ত হতে হবে।
- ☞ চাষে জৈব সার ব্যবহার করা হলে তা কম্পোষ্ট হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।
- ☞ ধানের বালাই দমনে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করতে হবে।
- ☞ এমন কোন রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করা যাবে না যা এফডিএ বা অন্য কোন সংস্থা কর্তৃক ব্যবহারে বাধা নিষেধ রয়েছে।
- ☞ পরিমিত মানসম্পন্ন সম্পূরক খাবার প্রয়োগ করতে হবে।
- ☞ ধান কাটার সময় পানি কমিয়ে নিতে হবে। ক্ষেতে ধান গাছের গোড়া বা নাড়া না থাকাই উত্তম।
- ☞ চিংড়ি আহরণ ও নাড়াচাড়ায় যত্ন নিতে হবে। কম পীড়ন বা ধকল হয় এমন সরঞ্জাম দিয়ে চিংড়ি ধরতে হবে।
- ☞ চিংড়ি ধরার পর বিক্রয় কেন্দ্রে নেয়া পর্যন্ত জীবন্ত বা সতেজ / টাটকা রাখতে হবে।

## বাৎসরিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রেকর্ড সংরক্ষণ ঃ

- বছরের প্রথমেই বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা তৈরী করতে হবে।
- চাষ ব্যবস্থার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল রেকর্ড রাখতে হবে।
- পোনার উৎস্য, খাদ্যের ধরন, সকল খরচ ও সকল আয়ের রেকর্ড রাখতে হবে।
- মাছ উৎপাদনের সকল তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।
- এক্ষেত্রে নিজেদের খাওয়া এবং উপহার হিসেবে দেওয়া সকল মাছের হিসাব রাখতে হবে।

## আয় ব্যয় হিসাব (প্রতি একরে)

**ব্যয়** ঃ ধানের সাথে গলদা চিংড়ির চাষ

| ক্রমিক নং | উপকরণ | পরিমান | একক ব্যয় | মোট ব্যয় | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | জুভেনাইল | ১০০০ টি | ৮.০০ | ৮,০০০.০০ | |
| ২ | কার্প | ১০০০ টি | ৮.০০ | ৮,০০০.০০ | |
| ৩ | চুন | ২০ কেজি | ১৫.০০ | ৩০০.০০ | |
| ৪ | সম্পুরক খাবার | ২০০ কেজি | ৫০.০০ | ১০,০০০.০০ | |
| ৫ | নালা তৈরি, মেরামত, শ্রমিক ও অন্যান্য | - | - | ১০,০০০.০০ | |
| মোট | | | | ৩৬,৩০০.০০ | |

**আয়** ঃ ধানের সাথে গলদা চিংড়ির চাষ

| ক্রমিক নং | বিবরণ | উৎপাদন (কেজি) | একক মুল্য | মোট মুল্য | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | গলদা | ৫৬ | ৭০০.০০ | ৩৯,২০০.০০ | |
| ২ | কার্প | ৩৪৪ | ১০০.০০ | ৩৪,৪০০.০০ | |
| মোট | | | | ৭৩,৬০০.০০ | |

## আয় ব্যয় হিসাব

**খরচ** ঃ ধানের পরে গলদা চিংড়ির চাষ

| ক্রমিক নং | উপকরণ | পরিমান | একক ব্যয় | মোট ব্যয় | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | জুভেনাইল | ১৫০০ টি | ৮.০০ | ১২,০০০.০০ | |
| ২ | কার্প | ১৩০০ টি | ৮.০০ | ১০,৪০০.০০ | |
| ৩ | সার | ১৫০ কেজি | ২০.০০ | ৩,০০০.০০ | |
| ৪ | চুন | ১০০ কেজি | ১৫.০০ | ১,৫০০.০০ | |
| ৫ | সম্পুরক খাবার | ৮৫০ কেজি | ৫০.০০ | ৪২,৫০০.০০ | |
| ৬ | নালা তৈরি, মেরামত, শ্রমিক ও অন্যান্য | - | - | ২০,০০০.০০ | |
| মোট | | | | ৮৯,৪০০.০০ | |

**আয়** ঃ ধানের পরে গলদা চিংড়ির চাষ

| ক্রমিক নং | বিবরণ | উৎপাদন (কেজি) | একক মুল্য | মোট মুল্য | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | জুভেনাইল | ৯৬ | ৭০০.০০ | ৬৭,২০০.০০ | |
| ২ | কার্প | ৮৫০ | ১২০.০০ | ১,০২,০০০.০০ | |
| মোট | | | | ১,৬৯,২০০.০০ | |

## ধানক্ষেতে গলদা চাষের অর্থনীতি

ধান চাষ আমাদের দেশে মুলত: বংশানুক্রমিক পেশা বা জীবিকা। তবে শুধু ধান থেকে নীট মুনাফা বেশ কম। এ কারণে অনেকেই ধান চাষে উৎসাহ হারিয়ে ফেলছেন। ধান ক্ষেতে গলদা চিংড়ি চাষ করে সার্বিকভাবে লাভের পরিমাণটা বেশ বাড়ানো সম্ভব।

ধান ক্ষেতে গলদা চিংড়ি চাষের আরেকটি বাড়তি সুবিধা হলো একটি ফসলের আয়ে অন্য ফসলে বিনোয়োগ করা যায়।

এক একর জমিতে এক বছরে গলদা থেকে আয় ঃ ১,৭০,০০০/- টাকা

এক একর একই জমিতে ধান থেকে আয়ঃ ৩৩,০০০/- টাকা

এক একর জমিতে একই সময়ে ধান ও গলদা থেকে আয়ঃ ২,০৩,০০০/- টাকা

পাড়ের শাকশজি থেকে আয়ঃ ৫০০০/- টাকা

এক একর একই জমিতে ধান ও গলদা চাষে মোট ব্যয়ঃ ১,০০,০০০/- টাকা

এক একর একই জমিতে ধান ও গলদা চিংড়ির চাষে নীট লাভ ঃ ১,০৩,০০০/- টাকা

# ধানের পরে গলদা চিংড়ি চাষ

| কার্যক্রম | মাসের নাম | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | বৈশাখ | জ্যৈষ্ঠ | আষাঢ় | শ্রাবন | ভাদ্র | আশ্বিন | কার্ত্তিক | অগ্রহায়ণ | পৌষ | মাঘ | ফাল্গুন | চৈত্র | মন্তব্য |
| আইল তৈরী ও বাঁধ দেওয়া | | | | | | | | | | | ■ | | |
| ধানক্ষেতে ডোবা ও নালা নির্মাণ | | | | | | | | | | | | ■ | |
| জমি চাষ দেয়া | | | | | | | | | | | | ■ | |
| ধানের চারা রোপন | ■ | | | | | | | | | | | | |
| ধান কাটা | | | | ■ | | | | | | | | | |
| গলদার পোনা ছাড়া | ■ | | | | | | | | | | | | |
| গলদা আহরণ | | | | | | ■ | | | | | | | |

# ধানের সাথে গলদা চিংড়ি চাষ

| কার্যক্রম | মাসের নাম | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | বৈশাখ | জ্যৈষ্ঠ | আষাঢ় | শ্রাবন | ভাদ্র | আশ্বিন | কার্ত্তিক | অগ্রহায়ণ | পৌষ | মাঘ | ফাল্গুন | চৈত্র | মন্তব্য |
| আইল তৈরী ও বাঁধ দেওয়া | | | | | | | | | | | | | |
| ধানক্ষেতে ডোবা ও নালা নির্মাণ | | | | | | | | | | | | | |
| জমি চাষ দেয়া | | | | | | | | | | | | | |
| ধানের চারা রোপন | | | | | | | | | | | | | |
| গলদার পোনা ছাড়া | | | | | • | | | | | | | | |
| গলদা আহরণ | | | | | | | | | | | | | |